০৪. সরল রাজযোগ

০০. প্রকাশকের নিবেদন / প্রস্তাবনা

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্য সারা সি.বুলের**(Mrs.Sara C.Bull)** বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গের সহিত 'যোগ' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, মিসেস বুল তাহা লিখিয়া রাখেন। পরে ভক্ত, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণের জন্য আমেরিকার বন্ধুগণ ১৯৯৩ খ্রীঃ তাহা প্রকাশ করেন। বর্তমান পুস্তিকা তাহারই ভাষান্তর।

ভারতীয় ইংরেজী সংস্করণ **(Six Lessons on Raja Yoga)** ১৯২৮ খ্রীঃ ফেব্রুআরি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের নিবেদন হইতে শেষ কয়েকটি পঙক্তির অনুবাদ দেওয়া হইলঃ

এই পাঠগুলি সম্বন্ধে বলা যায়-আধ্যাত্মিক সাধনার কথা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে ও পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত, উপরন্তু আছে-বিশেষতঃ রাজযোগসাধনার বহু মূল্যবান্ ইঙ্গিত ও পথনির্দেশ।

আমেরিকান সংস্করণে পুস্তকখানির প্রচ্ছদপট এইরূপে মুদ্রিতঃ

RAJA YOGA

Six Lessons

By

Swami Vivekananda

Gift Edition

1913

প্রস্তাবনা

রাজযোগও পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো একটি বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান মনের বিশ্লেষণ; অতীন্দ্রিয় জগতের তথ্যসংগ্রহ দ্বারাই এতে আধ্যাত্মিক রাজ্য গড়ে তোলা হয়। সকল দেশের মহান্ আচার্যেরাই ব'লে গেছেন, 'দেখেছি ও জানি'। যীশু, পল ও পিটার সকলেই বলেন, তাঁদের প্রচারিত সত্য তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন।

এই প্রত্যক্ষানুভূতি যোগ-লব্ধ।

স্মৃতি বা চেতনা সত্তার সীমা হ'তে পারে না; কেননা আর একটা অতীন্দ্রিয় অবস্থা আছে; সেখানে এবং অচেতন অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি নেই, কিন্তু এই দুটির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত, যেমন-জ্ঞান আর অজ্ঞান। যে যোগশাস্ত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, সেটা ঠিক বিজ্ঞানের মতোই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

মনের একাগ্রতাই হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস।

যোগ আমাদের শিক্ষা দেয়-কিভাবে জড়কে অধীন ক'রে রাখা যায়; জড় চিরদিন চেতনের অধীনই থাকবে।

'যোগ' মানে (Yoke) জুড়ে দেওয়া; অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ক'রে দেওয়া।

মন চেতন-ভূমিতে ও তার নিম্নস্তরে কাজ করে। আমরা যাকে চেতনা বলি, সেটা আমাদের প্রকৃতির অনন্ত শৃঙ্খলের একটা শিকলি-মাত্র।

একটুখানি চেতনা নিয়ে আমাদের এই 'আমি', আর তার চারদিকে বিরাট অচেতন সত্তা; এই 'আমি'র ওপারে আমাদের অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় ভূমি।

নিয়মিতভাবে ঠিক ঠিক যোগ অভ্যাস করলে মনের স্তর একটার পর একটা উন্মুক্ত হয়, আর প্রত্যেক স্তরে আমাদের সামনে নতুন নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়। আমরা দেখি, যেন আমাদের সামনে নতুন জগতের সৃষ্টি হচ্ছে, আমাদের হাতে যেন নতুন নতুন শক্তি এসে পড়ছে; কিন্তু মাঝ-রাস্তায় আমরা যেন থেমে না যাই! হীরের খনি সামনে পড়ে রয়েছে, কাঁচের পুঁতি যেন আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে না দেয়।

ভগবানই আমাদের লক্ষ্য, তাঁর কাছে যেতে না পারলে আমাদের বিনাশ।

যাঁরা সাধক-সিদ্ধি লাভ করতে চান, তাঁদের তিনটি জিনিস দরকার।

প্রথমঃ ইহলোকের ও পরলোকের সব ভোগ-বাসনা ছাড়তে হবে; চাইতে হবে শুধু ভগবান্ আর সত্য।

দ্বিতীয়ঃ সত্য আর ভগবানকে লাভ করবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা চাই। যে-মানুষ জলে ডুবছে, সে যেমন বাতাসের জন্য ব্যাকুল হয়, ঠিক তেমনি ব্যাকুল হও; সত্য ও ভগবানের জন্য ঐরকম অধীর হও।

তৃতীয়ঃ ছ-টি শিক্ষা। ১ম-মনকে বহির্মুখ হ'তে না দেওয়া। ২য়-মনকে অন্তর্মুখ ক'রে একটা ভাবে আবদ্ধ রাখা। ৩য়-প্রতিবাদ না ক'রে সব জিনিস সহ্য করা। ৪র্থ-শুধু ঈশ্বরকে চাও, আর কিছুই নয়। আপাত-মনোরম বিষয় আর যেন তোমাকে ঠকাতে না পারে। সব ত্যাগ ক'রে শুধু ভগবানকেই চাও। ৫ম-উপস্থিত কোন একটা বিষয় নাও, তার শেষ পর্যন্ত বিচার কর, সমাধান না ক'রে ছেড়ো না। সময়ের হিসাব ক'রো না। আমাদের জীবন সত্যকে জানবার জন্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়; ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুরা করুক, আমরা কখনও তাদের মতো ভোগ করতে পারি না। মানুষ মননশীল; মৃত্যুকে সে যতদিন না জয় করে, যতদিন না আলোকের সন্ধান পায়, ততদিন সে সংগ্রাম করবেই। নিষ্ফল বৃথা কথাবার্তায় সে নিজের শক্তিক্ষয় করবে না। সামাজিকতা ও লোকমতের পূজাই হচ্ছে পৌত্তলিকতা। আত্মা-লিঙ্গহীন, জাতিহীন, দেশহীন ও কালহীন। ৬ষ্ঠ-সর্বদা নিজের স্বরূপ চিন্তা কর। কুসংস্কারের পারে যাও। ক্রমাগত 'আমি ছোট, আমি ছোট'-এই ভেবে নিজেকে ছোট ক'রে ফেলো না;

যতদিন না ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদজ্ঞান(অপরোক্ষানুভূতি) হচ্ছে, ততদিন দিনরাত্র নিজেকে বলো-তোমার স্বরূপের কথা।

এই সব কঠোর সাধননিষ্ঠা ব্যতীত কোন ফল-লাভ সম্ভব নয়।

নিরপেক্ষ পরব্রহ্ম উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু আমরা কখনও তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না; যে মুহূর্তে প্রকাশ করতে যাই, তখনি তাঁকে সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলি; ফলে অনন্ত হয়ে পড়েন সান্ত।

ইন্দ্রিয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেতে হবে, বুদ্ধিকেও অতিক্রম করতে হবে; আর এ শক্তি আমাদের কাছে।

প্রাণায়ামের প্রথম সাধন এক সপ্তাহ অভ্যাস ক'রে শিষ্য গুরুকে জানাবে।

০১. প্রথম পাঠ

প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্ব বিকশিত করতে হবে। সকলেই এক কেন্দ্রে গিয়া মিলিত হবে।

'কল্পনাই প্রেরণার উৎস ও চিন্তার ভিত্তি।'

প্রকৃতির ব্যাখ্যা আমাদের ভেতরেই রয়েছে; পাথর পড়ে-এটা বাইরের ঘটনা, কিন্তু 'মাধ্যাকর্ষণ'-আবিষ্কারের শক্তি আমাদের ভেতরেই ছিল, বাইরে নয়।

যে বেশী খায় বা যে অনাহারী, যে বেশী ঘুমোয় বা যে খুব কম ঘুমোয়, সে যোগী হ'তে পারে না।১

অজ্ঞান, চঞ্চলতা, ঈর্ষা, আলস্য ও তীব্র আসক্তি-এই ক-টি যোগাভ্যাসের পরম শত্রু। যোগীর পক্ষে এই তিনটি বিশেষ প্রয়োজনীয়ঃ

প্রথম-দেহ ও মনের পবিত্রতা। সব রকমের মলিনতা, যা মনকে নীচে নামিয়ে দেয়, যোগী তা পরিত্যাগ করবে।

দ্বিতীয়-ধৈর্য। প্রথম প্রথম অনেক আশ্চর্য দর্শনাদি হবে, তারপর সে-সব বন্ধ হয়ে যাবে। এটিই হচ্ছে সব চেয়ে কঠিন সময়, কিন্তু ধরে থাকা চাই; ধৈর্য থাকলে শেষে সত্য লাভ হবেই।

তৃতীয়-অধ্যবসায়। সম্পদে বিপদে, স্বাস্থ্যে রোগে-সব সময় যোগ অভ্যাস ক'রে যাও, একটি দিনও বাদ দিও না।

যোগ-সাধনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হচ্ছে দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ-সে-সময় দেহ ও মন খুব শান্ত থাকে, চঞ্চলতা ও অবসাদ কিছুরই তখন প্রাবল্য থাকে না। যদি সে-সময় না পারো, তা হ'লে ঘুম থেকে উঠে এবং শুতে যাবার আগে সাধন অভ্যাস করবে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা খুব পরিপাটিভাবে প্রয়োজন(প্রত্যহ স্নান করবে)।

স্নানের পর বেশ দৃঢ়ভাবে আসনে বসবে, মনে করবে তুমি যেন পাহাড়ের মতো অটল, কোন কিছুই তোমাকে নড়াতে পারবে না। মেরুদন্ডের উপর জোর না দিয়ে কোমর, ঘাড় ও মাথা ঋজুভাবে রাখবে। মেরুদন্ডের ভেতর দিয়েই সব ক্রিয়া হয়, কাজেই সেটিকে দুর্বল করা চলবে না।

পায়ের আঙুল থেকে আরম্ভ ক'রে ধীরে ধীরে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ স্থির করবে। এই স্থির ভাবটি মনে মনে চিন্তা কর, দরকার মনে হয় তো প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করবে।

মাথায় না পৌঁছনো পর্যন্ত ধীরে ধীরে নীচের দিক থেকে শরীরের প্রতি অঙ্গ স্থির করতে করতে ওপরের দিকে আসবে, যেন একটি অঙ্গও বাদ না যায়। তারপর সমস্ত দেহটি স্থির ক'রে রাখবে।

১ গীতা, ৬।১৬

১-১০

সত্য লাভ করবার জন্য ভগবান্ তোমায় এই দেহ দিয়েছেন; এই নৌকা আশ্রয় করেই সংসার-সমুদ্রের পারে চিরন্তন সত্যের রাজ্যে তোমায় যেতে হবে।

এটি করা হয়ে গেলে দুই নাসারন্ধ্র দিয়ে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহন করবে, তারপর দুই নাসা দিয়েই নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। তারপর যতক্ষণ বেশ স্বচ্ছন্দভাবে পারো, শ্বাস রুদ্ধ ক'রে থাকবে। এইরকম চারবার করা হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেবে এবং জ্ঞানালোকের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে।

'যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মহিমা আমি ধ্যান করি, তিনি আমাদের মনকে প্রবুদ্ধ করুন'-আসনে বসে দশ-পনর মিনিট এই মন্ত্রটির১ অর্থ চিন্তা কর।

যে-সব উপলব্ধি বা দর্শনাদি হবে, গুরু ছাড়া আর কাকেও তা বলবে না।

যতটা সম্ভব কম কথা বলবে।

সৎ চিন্তা করবে; আমরা যা চিন্তা করি, তাই হয়ে যাই। সৎ চিন্তা মনের সকল মলিনতা দগ্ধ করতে সাহায্য করে।

যোগী ছাড়া আর সকলেই যেন ক্রীতদাস। মুক্তিলাভের জন্য বন্ধনের পর বন্ধন কেটে ফেলতে হবে।

অতীন্দ্রিয় সত্তাকে সকলেই জানতে পারে। ভগবান্ যদি সত্য হন, তবে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হবে; আত্মা যদি থাকে, তবে নিশ্চয় আমরা তাঁকে দর্শন ও অনুভব করতে পারবো।

আত্মবস্তু আছে কিনা, তা বোঝার একমাত্র উপায়-এমন একটা কিছু হওয়া, যা দেহ নয়।

যোগীরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করেন-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়(অথবা জ্ঞান ও কর্ম)।

অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের স্তর চারটি।

প্রথম-মনঃ,মনন বা চিন্তাশক্তি। একে সংযত না করলে এর সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যায়; সংযত করলে মনই আবার অদ্ভুত শক্তির আধার হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়-বুদ্ধি বা ইচ্ছাশক্তি(তাকে বোধশক্তিও বলা যায়)।

তৃতীয়-অহংকার বা 'অহং'-বুদ্ধি।

চতুর্থ-চিত্ত, এটিই হ'ল উপাদান, যাতে সকল বৃত্তি ক্রিয়া করছে, মনের ভিত্তিতল, সকল বৃত্তির আধার। এ যেন সমুদ্র, আর বৃত্তিগুলি যেন এরই তরল।

চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নামই যোগ-'যোগ' এক প্রকার বিজ্ঞান, যার সাহায্যে আমরা চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তিতে রূপান্তরিত হওয়া বন্ধ করতে পারি। সমুদ্রে চাঁদের প্রতিবিম্ব যেমন তরঙ্গে

তরঙ্গে ভেঙে অস্পষ্ট হয়ে যায়, আত্মার প্রতিবিম্বও তেমনি মনের তরঙ্গাঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

১ গায়ত্রী মন্ত্র

সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হয়ে যখন আয়নার মতো শান্ত হয়, তখনই তাতে চাঁদের পূর্ণ প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই; তেমনি মনের উপাদান চিত্ত যখন সংযমের দ্বারা সম্পূর্ণ শান্ত হয়, তখনই আত্মদর্শন ঘটে।

মনের উপাদান চিত্ত, শরীর নয়-সূক্ষ্মতর জড়বিশেষ, এবং চিরকাল দেহ দ্বারা আবদ্ধও থাকে না। মাঝে মাঝে আমাদের দেহ-বন্ধন যে শিথিল হয়ে যায়, তা-ই এর প্রমাণ। ইন্দ্রিয়সমূহ বশে এনে আমরা ইচ্ছামত এই অবস্থালাভ করবার অভ্যাস করতে পারি।

এই অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হ'লে আমরা সমগ্র জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, কারণ ইন্দ্রিয়গণ যে-সব বিষয় আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়, সেগুলি নিয়েই তো আমাদের জগৎ। স্বাধীনতাই উচ্চতর জীবনের চিহ্ন। ইন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ।

যে ইন্দ্রিয়ের অধীন, সেই সাংসারিক, সেই ক্রীতদাস।

চিত্তবস্তুর বিভিন্ন বৃত্তি-তরঙ্গে ভেঙে পড়া সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করতে পারলেই আমাদের দেহবোধ চলে যায়। এই দেহগুলি তৈরি করতে কোটি কোটি বৎসর ধরে আমাদের এতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে যে, সেই প্রচেষ্টার মধ্যে এই দেহপ্রাপ্তির আসল উদ্দেশ্য যে পূর্ণতা লাভ করা, তা আমরা ভুলে গেছি। আমরা ভাবি, এই দেহটাকে তৈরি করাই বুঝি আমাদের সমস্ত চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য; এই-ই মায়া। এই মায়া আমাদের ভাঙতে হবে, মূল লক্ষ্যের দিকে ফিরতে হবে; আর উপলব্ধি করতে হবে-আমরা দেহ নই, দেহ আমাদের ভৃত্য।

মনকে দেহ থেকে আলদা ক'রে দেখতে শেখো, ভাবো-মন দেহ থেকে পৃথক্। এই জড় দেহটাকে আমরাই চেতনা ও জীবন দিই, তারপর ভাবি এটা চেতন ও বাস্তব। আমরা এত দীর্ঘকাল ধ'রে এই পোশাকটা প'রে আসছি যে, এখন ভুলে গেছি-আমরা ও এই পোশাক অভিন্ন নই, এবং ইচ্ছামত এই পোশাক ছেড়ে ফেলা যায়। যোগ এই বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারে। দেহ একটা যন্ত্রমাত্র, আমাদের দাস-প্রভু নয়; মনঃশক্তিসমূহকে আয়ত্ত করাই যোগাভ্যাসের মুখ্য ও মহান্ উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য-যে-কোন বিষয়ে সমগ্রভাবে মনের শক্তিগুলি নিয়োগ করা।

যদি বেশী কথা বলো, তাহলে যোগী হ'তে পারবে না।

০২. দ্বিতীয় পাঠ

এই যোগের নাম অষ্টঙ্গযোগ, কারণ এর প্রধান অঙ্গ আটটি। যথা-

প্রথম-যম। যোগের এই অঙ্গটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি সারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। এটি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্তঃ

(১) কায়মনোবাক্যে হিংসা না করা।

(২) কায়মনোবাক্যে লোভ না করা।

(৩) কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা করা।

(৪) কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠ হওয়া।

(৫) কায়মনোবাক্যে বৃথা দান গ্রহন না করা(অপ্রতিগ্রহ)।

দ্বিতীয়-নিয়ম। শরীরের যত্ন, স্নান, পরিমিত আহার ইত্যাদি।

তৃতীয়-আসন। মেরুদন্ডের উপর জোর না দিয়ে কটিদেশ, স্কন্ধ ও মাথা ঋজুভাবে রাখতে হবে।

চতুর্থ-প্রণায়াম। প্রাণবায়ুকে আয়ত্ব করবার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের সংযম।

পঞ্চম-প্রত্যাহার। মনকে বহির্মুখ হ'তে না দিয়ে অন্তর্মুখ ক'রে কোন জিনিস বোঝবার জন্য বারংবার আলোচনা।

ষষ্ঠ-ধারণা। কোন এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা। সপ্তম-ধ্যান। কোন এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা।

অষ্টম-সমাধি। জ্ঞানের আলোক লাভ করাই আমাদের সকল সাধনার লক্ষ্য।

যম ও নিয়ম সারা জীবন ধ'রে আমাদের অভ্যাস করতে হবে। জোঁক যেমন একটা ঘাস দৃঢ়ভাবে না ধরা পর্যন্ত আর একটা ছেড়ে দেয় না, তেমনি একটি সাধন ছাড়বার আগে অপরটি বেশ ক'রে বোঝা এবং অভ্যাস করা চাই।

আজকের আলোচ্য বিষয়-প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের নিয়মন। রাজযোগের সাধনায় প্রাণবায়ু চিত্তভূমির মধ্য দিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যে নিয়ে যায়। প্রাণবায়ু বা শ্বাসপ্রশ্বাস হচ্ছে সমগ্র দেহ-যন্ত্রের নিয়ামক মূল চক্র **(Fly-wheel)**। প্রাণ প্রথমে ফুসফুসে, ফুসফুস থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে রক্ত-প্রবাহে, সেখান থেকে মস্তিষ্কে, সব শেষে মস্তিষ্ক থেকে মনে কাজ করে। ইচ্ছা-শক্তি বাহ্য সংবেদন উৎপন্ন করতে পারে, বাহ্য সংবেদনও ইচ্ছা-শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে। আমাদের ইচ্ছা দুর্বল; আমরা এতই বদ্ধ যে, ইচ্ছার যথার্থ শক্তিকে আমরা উপলব্ধি করি না। আমাদের অধিকাংশ কার্যের প্রেরণা আসে বাইরে থেকে; বহিঃপ্রকৃতি

আমাদের অন্তরের সাম্যভাব নষ্ট করে, কিন্তু আমরা তার সাম্যভাব নষ্ট করিতে পারি না (যেটা আমাদের পারা উচিত)। কিন্তু এ-সবই ভুল, প্রকৃতপক্ষে অধিকতর শক্তি রয়েছে আমাদের ভেতরে।

যাঁরা নিজেদের অন্তরের চিন্তারাজ্য জয় করেছেন, তাঁরাই বড় বড় সাধু ও আচার্য, তাঁদের কথার শক্তিও তাই এত বেশী। উচ্চ দুর্গে আবদ্ধ কোন মন্ত্রীকে তাঁর স্ত্রী গুবরে-পোকা, মধু, রেশমের সুতো, দড়ি ও কাছি দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন-এই রূপকের১ সাহায্যে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে-প্রাণের নিয়মন থেকে কি ক'রে ক্রমে ক্রমে মনোরাজ্য জয় করা যায়। প্রাণায়াম-রূপ রেশমসুতোর সাহায্যেই একটার পর একটা শক্তি আয়ত্ত ক'রে আমরা একাগ্রতা-রূপ রজ্জু ধ'রব, আর সেই রজ্জুর সাহায্যে দেহ-কারাগার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রকৃত মুক্তি লাভ ক'রব।

১ এই খন্ডেই 'রাজযোগ' গন্থের ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মুক্তি লাভ ক'রে তার সাধনগুলি আমরা ছেড়ে দিতে পারি।

প্রাণায়ামের অঙ্গ তিনটিঃ ১মঃ পূরক-শ্বাসগ্রহণ। ২য়ঃ কুম্ভক-শ্বাসরোধ। ৩য়ঃ রেচক-শ্বাসত্যাগ।

দুটি শক্তি-প্রবাহ মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে এসে মেরুদন্ড বয়ে তার শেষভাগে পরস্পরকে অতিক্রম ক'রে আবার মস্তিষ্কে ফিরে যায়। প্রবাহ-দুটির একটির নাম সূর্য (পিঙ্গলা), এটি মস্তিষ্কের দক্ষিণার্ধ থেকে বেরিয়ে মেরুদন্ডের বাঁদিকে মস্তিষ্কের ঠিক নিম্নে একবার পরস্পরকে অতিক্রম করে, আবার মেরুর নীচে চার (৪)-এর অর্ধেকের মতো আকারে আর একবার পরস্পরকে অতিক্রম করে যায়।

অন্য প্রবাহটির নাম চন্দ্র (ঈড়া),এর গতি পিঙ্গলার ঠিক উলটো এবং ৪-এর আকার সম্পূর্ণ করে। দেখতে চার(৪)-এর মতো হলেও এর নীচের দিকটা উপরের দিকের চেয়ে অনেকটা লম্বা। এই দুটো প্রবাহ দিনরাত্রি বইছে, আর বিভিন্ন কেন্দ্রে যাকে আমরা 'চক্র'

(Plexuses) বলি, এরা প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে, কিন্তু তা আমরা প্রায় জানতে পারি না। একাগ্রতার দ্বারা এই শক্তিসমূহ এবং সমস্ত শরীরে তাদের ক্রিয়া আমরা অনুভব করতে পারি। এই 'সূর্য-ও চন্দ্র'-এর প্রবাহ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাই শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত ক'রে আমরা সমস্ত দেহটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি।

কঠ-উপনিষদে দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দ্রিয়গুলিকে ঘোড়া এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলিকে রাস্তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রথী আত্মা ও সারথি বুদ্ধি সেই রথে বসে আছেন। সারথি যদি বুদ্ধিরূপ ঘোড়াকে সংযত করতে না পারে, তা হ'লে কখনও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না, দুষ্ট ঘোড়ার মতো ইন্দ্রিয়গুলি রথকে যেখানে খুশি টেনে নিয়ে গিয়ে রথীকে ধ্বংস করেও ফেলতে পারে। কিন্তু এই দুটি শক্তি-প্রবাহ(ঈড়া ও পিঙ্গলা।) দুষ্ট অশ্বকে দমন করবার জন্য সারথির হাতে লাগামের মতো; এ দুটি(লাগাম) আয়ত্তে রেখে সারথি ওগুলিকে (অশ্ব) নিয়ন্ত্রণ করবে। নীতিপরায়ণ হবার শক্তি আমাদের লাভ করতে হবে, তা না হ'লে আমাদের কর্মগুলিকে আমরা কিছুতেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারব না। নীতিশিক্ষাগুলি কি ক'রে কর্মে পরিণত করতে পারা যায়, যোগ সেই শিক্ষা দেয়। নীতিপরায়ণ হওয়াই যোগের উদ্দেশ্য। জগতের বড় বড় আচর্যমাত্রেই যোগী ছিলেন এবং প্রত্যেক শক্তিপ্রবাহকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বশে এনেছিলেন। এই প্রবাহ-দুটিকে যোগীরা মেরুর নিম্নভাগে(মূলাধারে) সংযত ক'রে মেরুদন্ডের ভেতর দিয়ে চালিত করেন, আর তখনই তা জ্ঞান-প্রবাহে পরিণত হয়, এ শুধু যোগীর মধ্যেই বর্তমান।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে দ্বিতীয় সাধন-প্রণালী-সকলের পক্ষে এক রকম নয়। প্রাণায়াম-একটা ছন্দের তালে তালে নিয়মিতভাবে করতে হবে এবং তা করবার সহজ উপায় হচ্ছে গণনা করা, তবে সেটা একেবারে যন্ত্রের মতো হয়ে পড়ে, তাই গণনায় নির্ধারিত সংখ্যায় আমরা পবিত্র 'ওঁ'কার মন্ত্র জপ করি।

এই প্রাণায়ামে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ ক'রে চারবার 'ওঁ' জপ করতে করতে বাম নাসায় ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হয়।

তারপর বাম নাকে তর্জনী রেখে দুটি নাসাই বন্ধ কর, মাথাটিকে বুকের উপর অবনমিত রেখে মনে মনে আটবার 'ওঁ' জপ করতে করতে শ্বাস রোধ ক'রে রাখো।

তারপর মাথা ফের সোজা ক'রে দক্ষিণ নাসা থেকে অঙ্গুষ্ঠ উঠিয়ে নিয়ে মনে মনে চারবার 'ওঁ' জপ করতে করতে ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলো।

যখন শ্বাস ফেলা শেষ হয়ে যাবে, তখন ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের ক'রে দেবার জন্য তলপেট সঙ্‌কুচিত করবে। তারপর বাম নাসা বন্ধ ক'রে চারবার 'ওঁ' জপ করতে করতে দক্ষিণ নাসা দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হবে।

তারপর অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দক্ষিণ নাসা বন্ধ ক'রে মাথা অবনমিত রেখে শ্বাস রোধ ক'রে আটবার 'ওঁ' জপ করবে। তারপর আবার মাথা সোজা ক'রে বাম নাসা খুলে দিয়ে চারবার 'ওঁ' জপ করতে করতে শ্বাস ত্যাগ করবে। সেই সময় আগের মতো তলপেট সঙ্‌কুচিত করা চাই।

যখনই বসবে, এইরকম দুবার করবে, অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় দুবার ও বাম নাসায় দুবার-মোট চারবার প্রাণায়াম করবে। বসবার আগে প্রার্থনা ক'রে নিলে ভাল হয়।

এক সপ্তাহ ধ'রে এইরকম অভ্যাস প্রয়োজন। তারপর ধীরে ধীরে প্রাণায়ামের সংখ্যা বাড়িয়ে দাও; সঙ্গে সঙ্গে জপের (শ্বাস-গ্রহন, রোধ ও ত্যাগের) সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে, অর্থাৎ যদি ছ-বার প্রাণায়াম কর, তা হ'লে শ্বাস নেবার সময় ছ-বার, নিশ্বাস ফেলবার সময় ছ-বার ও কুম্ভকের সময় বারো বার 'ওঁ' জপ করতে হবে। এই প্রাণায়াম-অভ্যাসের দ্বারা আমরা আরও বেশী পবিত্র, নির্মল ও আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ হবো। বিপথে চালিত হ'য়ো না; কোন শক্তি (সিদ্ধাই) চেও না। প্রেমই একমাত্র শক্তি, যা চিরকাল থাকে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যারা রাজযোগের পথে ভগবানের কাছে আসতে চায়-তাদের মানসিক, শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে শক্ত সবল হ'তে হবে। প্রতিটি পা ফেলবে আলোকিত পথে।

লক্ষের মধ্যে একজন বলতে পারে, 'এই সংসার অতিক্রম ক'রে আমি ভগবানের কাছে পৌঁছব।' সত্যের সম্মুখীন হ'তে পারে, এমন লোক খুব কম, কিন্তু তবু কোন-কিছু করতে গেলে সত্যের জন্য আমাদের মরতেও প্রস্তুত থাকতে হবে।

০৩. তৃতীয় পাঠ

কুন্ডলিনী। আত্মাকে জড় ব’লে জানলে চলবে না, তার যথার্থ স্বরূপ জানতে হবে। আমরা আত্মাকে দেহ ব’লে ভাবছি, কিন্তু একে ইন্দ্রিয় ও চিন্তা থেকে পৃথক্ ক’রে ফেলতে হবে; তবেই আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে, আমরা অমৃতস্বরূপ। পরিবর্তন মানেই কার্যকারণের দ্বৈতভাব; আর যা কিছু পরিবর্তনশীল, তাই নশ্বর। সুতরাং দেহ বা মন অবিনাশী হ’তে পারে না, কেন না তারা সর্বদা পরিবর্তনশীল। যা অপরিবর্তনীয়, একমাত্র তাই অবিনাশী; কারণ তার উপর ক্রিয়া করতে পারে, এমন আর কিছু নেই।

আমরা সত্য-স্বরূপ হয়ে যাই না, চিরকালই আমরা সেই সত্যস্বরূপ। কিন্তু যে অজ্ঞানের অবগুন্ঠন আমাদের কাছ থেকে সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে, তা সরিয়ে দিতে হবে। দেহ হচ্ছে চিন্তার বাহ্য বস্তুগত রূপ। সূর্য(পিঙ্গলা) চন্দ্রের(ঈড়া) গতি দেহের সর্বাংশে শক্তিসঞ্চার করছে; অবশিষ্ট শক্তি মেরুদন্ডের(সুষুম্নার) অন্তর্গত বিভিন্ন চক্রে-সাধারণ ভাষায় স্নায়ুকেন্দ্রে সঞ্চিত থাকে। এই গতিগুলি মৃতদেহে দেখা যায় না, কেবল সুস্থ সবল শরীরেই থাকে।

যোগীর এই সুবিধা-তিনি যে শুধু এগুলি অনুভব করেন তা নয়, সত্য সত্যই এগুলি দেখতেও পান। এগুলি প্রাণবন্ত, জ্যোতির্ময়; চক্রগুলিও ঠিক তাই।

কার্য সাধারণতঃ চেতন ও অচেতন-এই দু প্রকার। যোগীদের আর এক প্রকার কর্ম আছে, সেটি অতিচেতন; এটিই হচ্ছে সর্বদেশে সর্বকালে সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল উৎস। সহজাত জ্ঞানের ক্রমবিকাশই আমাদের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায। অতিচেতন অবস্থায় কোন ভুল হয় না; কিন্তু সহজাত জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেও তা নিছক যান্ত্রিক, কারণ এ স্তরে সজ্ঞান ক্রিয়া থাকে না। একে ‘প্রেরণা’ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যোগীরা বলেন, ‘এই শক্তি প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে আছে’, কালে সকলেই এই শক্তির অধিকারী হবে।

চন্দ্র ও সূর্যের (ঈড়া ও পিঙ্গলা) গতিকে একটা নতুন দিকে নিয়ে যেতে হবে, অর্থাৎ মেরুদন্ডের মধ্য দিয়ে তাদের জন্য একটা নতুন পথ খুলে দিতে হবে। যখন এই ‘সুষুম্না’-পথ দিয়ে তাদের গতি সহস্রার পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দেহজ্ঞান একবারে চলে যাবে।

মেরুদন্ডের নিম্নদেশে যে 'মূলাধার-চক্র' আছে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থানটি হচ্ছে প্রজনন-শক্তিবীজের আধার। একটি ত্রিকোণ-মন্ডলে একটি ছোট সাপ কুন্ডলী পাকিয়ে আছে-যোগীরা এই প্রতীকে একে প্রকাশ করেছেন। এই নিদ্রিত সর্পই কুন্ডলিনী, এর ঘুম ভাঙানোই হচ্ছে রাজযোগের একটিমাত্র লক্ষ্য।

পাশব কার্য থেকে যে যৌনশক্তি উত্থিত হয়, তাকে ঊর্ধ্বদিকে মানবশরীরে মহাবিদ্যুদাধার মস্তিষ্কে প্রেরণ করতে পারলে সেখানে সঞ্চিত হয়ে তা 'ওজঃ' বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয়। সকল সৎ চিন্তা, সকল প্রার্থনা ঐ পশুশক্তির কিছুটা ওজঃশক্তিতে পরিণত ক'রে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিলাভে সাহায্য করে। এই 'ওজস্' হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব, একমাত্র মনুষ্যশরীরেই এই শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব। যার ভেতরে সমগ্র পাশব যৌনশক্তি ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে, তিনি একজন দেবতা। তাঁর কথায় অমোঘ শক্তি, তাঁর কথায় জগৎ নবজীবন লাভ করে।

যোগীরা মনে কল্পনা করেন যে, এই কুন্ডলিনী সর্প সুষুম্না-পথে স্তরে স্তরে চক্রের পর চক্র ভেদ ক'রে সহস্রারে উপনিত হয়। মনুষ্যশরীরের শ্রেষ্ঠ শক্তি যৌনশক্তি যে পর্যন্ত না ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়, সে পর্যন্ত নারী বা পুরুষ কেউই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারে না।

কোন শক্তিই সৃষ্টি করা যায় না; তবে তাকে শুধু ঈপ্সিত পথে চালিত করা যেতে পারে। অতএব যে বিরাট শক্তি এখনই আমাদের অধিকারে আছে, তাকে আয়ত্ত করতে শিখে, প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ঐ শক্তিকে পাশব হ'তে না দিয়ে আধ্যাত্মিক ক'রে তুলতে হবে। এইভাবে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পবিত্রতাই সর্বপ্রকার ধর্ম ও নীতির ভিত্তি। বিশেষতঃ রাজযোগে কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ পবিত্রতা অপরিহার্য; বিবাহিত বা অবিবাহিত-উভয়ের পক্ষে একই নিয়ম। দেহের সর্বাপাক্ষা শক্তিশালী বস্তুর যে অপচয় করে, সে কখনও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারবে না।

ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়, সর্বযুগের বড় বড় সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তিগণ হয় সাধুসন্ন্যাসী, না হয় তাঁরা বিবাহিত জীবন ত্যাগ করেছেন। যাঁদের জীবন পবিত্র, কেবল তাঁরাই ভগবানের দর্শন পান।

প্রাণায়ামের পূর্বে ঐ ত্রিকোণ-মন্ডলকে ধ্যানে দেখবার চেষ্টা কর। চোখ বন্ধ ক'রে এর ছবি মনে মনে স্পষ্টরূপে কল্পনা করবে। ভাবো, এর চারপাশে আগুনের শিখা, আর তার মাঝখানে কুন্ডলীকৃত সর্প ঘুমিয়ে রয়েছে। ধ্যানে যখন এই কুন্ডলিনীশক্তি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, তখন কল্পনায় তাকে মেরুদন্ডের মূলাধারে স্থাপন কর; কুম্ভক-কালে শ্বাস রুদ্ধ রাখার সময় (সুপ্ত) কুন্ডলিনীকে জাগাবার জন্যে ঐ রুদ্ধ বায়ু সবলে তার মস্তকে নিক্ষেপ করবে। যার কল্পনা-শক্তি যত বেশী, সে তত শীঘ্র ফল পায়, আর তার কুন্ডলিনীও তত শীঘ্র জাগেন। যতদিন তিনি না জাগেন, ততদিন কল্পনা কর-তিনি জেগেছেন। আর ঈড়া ও পিঙ্গলার গতি অনুভব করবার চেষ্টা কর, জোর ক'রে তাদের সুষুম্না-পথে চালাতে সচেষ্ট হও। এতে কাজ খুব তাড়াতাড়ি হবে।

০৪. চতুর্থ পাঠ

মনকে সংযত করবার পূর্বে মনকে জানতে হবে।

চঞ্চল মনকে সংযত ক'রে বিষয় থেকে টেনে এনে একটা ভাবে স্থির ক'রে রাখতে হবে। বারবার এইরকম করতে হবে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে সংযত ক'রে, রুদ্ধ ক'রে ভগবানের মহিমা চিন্তা কর।

মনকে সংযত করবার সব চেয়ে সোজা উপায় চুপ ক'রে বসে কিছুক্ষণের জন্য মনকে ছেড়ে দেওয়া, যেখানে সে ভেসে যেতে চায় যাক-দৃঢ়ভাবে চিন্তা করবে, 'আমি দ্রষ্টা, সাক্ষী; বসে বসে মনের ভাসাডোবা-ভেসে-যাওয়া দেখছি। মন আমি নয়!' তারপর মনটাকে দেখ। ভাবো, মন থেকে তুমি সম্পূর্ণরূপে পৃথক। ভগবানের সঙ্গে নিজেকে অভিন্নভাবে চিন্তা কর, জড়বস্তুর বা মনের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে ফেলো না।

কল্পনা কর-মন যেন তোমার সম্মুখে প্রসারিত একটা নিস্তরঙ্গ হ্রদ, এবং যে চিন্তাগুলি মনে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে, সেগুলি যেন হ্রদে বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে আর তার বুকে লয় পাচ্ছে। চিন্তাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করবার কোন চেষ্টা ক'রো না, কল্পনার চক্ষে সেগুলি কেবল সাক্ষীর

মতো দেখে যাও-কেমন ক’রে তারা ভেসে চলেছে। একটা পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন প্রথমে খুব ঘন ঘন তরঙ্গ ওঠে, তারপর তরঙ্গের পরিধি যত বেড়ে যায়, তরঙ্গ তত কমে আসে; তেমনি মনকে ঐভাবে ছেড়ে দিলে তার চিন্তার পরিধি যত বেড়ে যাবে, মনোবৃত্তি তত কমে আসবে। কিন্তু আমরা এই প্রণালী উলটে দিতে চাই। প্রথমে একটা চিন্তার বড় বৃত্ত থেকে আরম্ভ ক’রে সেটাকে ছোট করতে করতে যখন মন একটা বিন্দুতে আসবে, তখন তাকে সেখানে স্থির ক’রে রাখতে হবে। এই ভাবটি ধারণা করঃ আমি মন নই; আমি দেখছি-আমি চিন্তা করছি, আমি আমার মনের গতিবিধি লক্ষ্য করছি। এইরকম অভ্যাস করতে করতে নিজের সঙ্গে মনের যে অভিন্নভাব, তা দিন দিন কমে আসবে; শেষ পর্যন্ত নিজেকে মন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ ক’রে ফেলতে পারবে, এবং ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে, মন তোমার থেকে পৃথক্।

এটা যখন হয়ে যাবে, তখন মন তোমার চাকর, তাকে তুমি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। যোগী হওয়ার প্রথম স্তর-ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিক্রম করা; আর যখন মনকে জয় করা হয়ে গেছে, তখন সাধক সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে।

যতদূর সম্ভব একলা থাকবে। আসন নাতি-উচ্চ হওয়া উচিত; প্রথমে কুশাসন, তারপর মৃগচর্ম, তারপর রেশম বা পট্টবস্ত্র বিছাবে। হেলান দেবার কিছু না থাকাই ভাল, আর আসন যেন দৃঢ় হয়।

সর্বপ্রকার চিন্তা ত্যাগ ক’রে মনকে খালি ক’রে ফেলো; যখনই কোন চিন্তা মনে উঠবে, তখনই তাকে দূর ক’রে দেবে। এই কাজ সম্পন্ন করতে গেলে জড় বস্তুকে ও আমাদের দেহকে অতিক্রম ক’রে যেতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের সমগ্র জীবনই ঐ অবস্থা আনবার একটি অবিরাম চেষ্টা।

চিন্তাগুলি ছবি, ওগুলি আমরা সৃষ্টি করি না। প্রত্যেক ধ্বনির বা শব্দের নিজস্ব অর্থ আছে; আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে এগুলি জড়িত।

আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছেন ভগবান্। তাঁকেই ধ্যান কর। আমরা জ্ঞাতাকে জানতে পারি না, কারণ আমাদের স্বরূপই যে তিনি। অশুভ দেখি বলেই অনর্থের সৃষ্টি আমরা নিজেরাই

করি। আমরা ভিতরে যা, বাইরে তাই দেখি, কেন না জগৎটা আমাদের আয়নার মতো। এই ছোট দেহটা আমাদের সৃষ্ট একখানি ছোট আয়না, প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বই হচ্ছে আমাদের শরীর। সর্বদা এই চিন্তা করতে হবে, তবেই বুঝতে পারবো-আমরা মরি না বা কাকেও আঘাত করতে পারি না, কারণ যাকে আঘাত ক'রব সেও যে আমিই। আমাদের জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই; আমাদের কর্তব্য শুধু সকলকে ভালবেসে যাওয়া।

'এই বিশ্বজগৎ আমার শরীর; সমস্ত স্বাস্থ্য, সমস্ত আনন্দ আমারই; কারণ সবই যে বিশ্বের ভেতর।' বলো, 'আমি এই বিশ্বজগৎ'। অবশেষে বুঝতে পারি-যা কিছু কর্মব্যাপার, সবই আমাদের থেকে আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

যদি মনে হচ্ছে, আমরা ছোট তরঙ্গের মতো, আমাদের সকলের পশ্চাতে এক অখন্ড সমুদ্র, এবং আমরা সকলেই তার সঙ্গে মিলিত। সমুদ্র ছাড়া তরঙ্গ একা থাকতে পারে না।

ঠিকভাবে নিয়োজিত হ'লে কল্পনা আমাদের পরম বন্ধুর কাজ করে। কল্পনা যুক্তির রাজ্য ছাড়িয়ে যায়, এবং একমাত্র কল্পনার আলোই আমাদের সর্বত্র নিয়ে যেতে পারে।

প্রেরণা আমাদের ভেতর থেকে ওঠে, তাই নিজ নিজ উচ্চতর শক্তি দ্বারা আমাদের নিজেদের অনুপ্রাণিত করতে হবে।

০৫. পঞ্চম পাঠ

প্রত্যাহার ও ধারণা। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'যে যে-পথ দিয়েই সন্ধান করুক, সকলেই আমার কাছে পৌঁছবে-সকলেই আমার কাছে পৌঁছবে।'১ প্রত্যাহার হচ্ছে মনকে গুটিয়ে এনে ঈপ্সিত বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা। এর প্রথম ধাপ-মনকে ছেড়ে দিয়ে তার উপর নজর রাখা এবং দেখা-মন কি ভাবে। যখনই কোন চিন্তার উপর বিশেষ নজর দেবে, অমনি সে চিন্তা বন্ধ হয়ে যাবে; কিন্তু চিন্তাগুলিকে জোর ক'রে বন্ধ করবার চেষ্টা ক'রো না, কেবল সাক্ষী হয়ে দেখে যাও। মন তো আর আত্মা নয়, মন হচ্ছে জড়ের একটু সূক্ষ্ম অবস্থামাত্র। স্নায়ুশক্তি দিয়ে একে আয়ত্ত ক'রে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনকে কাজে লাগানোর উপায় শিখে নিতে পারি।

দেহ হচ্ছে মনের (ব্যক্তিভাবের)বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আমরা আত্মা, দেহ-মনের অতীত; আমরা অনন্ত, অপরিবর্তনীয় সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। দেহটা চিন্তারই ঘনীভূত রূপ।

যখন বাম নাসা দিয়ে নিঃশ্বাস পড়বে তখন বিশ্রামের সময়, যখন দক্ষিণ নাসা দিয়ে পড়বে তখন কাজের সময়, যখন দুই নাসা দিয়েই পড়বে তখন ধ্যানের সময়। যখন দেহ-মন শান্ত হয়ে আসবে আর দুই নাসা দিয়েই সমানভাবে নিঃশ্বাস পড়বে, তখন বুঝতে হবে ঠিক ঠিক ধ্যানের অবস্থা হয়েছে। প্রথমেই জোর ক'রে মনকে একাগ্র করবার চেষ্টা ক'রে কোন লাভ নেই। চিন্তার নিয়ন্ত্রণ আপনিই হবে।

অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে বহুদিন এই প্রাণায়াম অভ্যাস করবার পর, কেবল চিন্তার মধ্য দিয়ে ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই ঐরকম করা যেতে পারে।

প্রাণায়ামের এইবার একটু পরিবর্তন দরকার। যে-সব সাধক ইষ্টমন্ত্র পেয়েছে, তারা রেচক ও পূরকের সময় 'ওঁ'কারের পরিবর্তে ইষ্টমন্ত্র এবং কুম্ভকের সময় 'হুঁ' মন্ত্র জপ করবে।

কুম্ভকের সময় যখন 'হুঁ' মন্ত্র জপ করবে, তখন মনে মনে কল্পনা করবে, সেই ধৃত নিঃশ্বাস পুনঃপুনঃ কুন্ডলিনীর মাথায় আঘাত করছে এবং তার দ্বারা তিনি যেন জাগরিত হচ্ছেন। শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে কর। ধ্যান করবার কিছুক্ষণ পরে আমরা বুঝতে পারবো যে, চিন্তাগুলি আসছে; কি ক'রে চিন্তাগুলি উঠছে আর আমরা কি-ই বা চিন্তা করতে যাচ্ছি, তাও বুঝতে পারবো। জাগ্রত অবস্থায় যেমন আমরা তাকিয়ে দেখতে পাই যে, একটা লোক আসছে, এও অনেকটা তেমনি। যখন আমরা মন থেকে আত্মাকে পৃথক্ করতে পারবো, যখন আমরা বুঝতে পারবো যে, আমরা ও আমাদের চিন্তা সম্পূর্ন আলাদা জিনিস, তখনই আমরা ঐ অবস্থায় পৌঁছেছি। চিন্তাগুলি যেন তোমাকে পেয়ে না বসে; সর্বদা তাদের পাশ কাটাবে, তা হলেই তারা আপনি বিলীন হয়ে যাবে।

সৎ চিন্তাগুলি অনুসরণ কর; তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাও। যখন তারা স্তিমিত হয়ে যাবে, তখন সর্বশক্তিমান্ ভগবানের শ্রীচরণ দেখতে পাবে। এই হচ্ছে অতিচেতন অবস্থা। ভাব যখন স্তিমিত হয়ে আসবে, তখন তার অনুসরণ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও বিলীন হয়ে যাও।

দ্যুতি হচ্ছে অন্তর্জ্যোতির প্রতীক, যোগী তা দেখতে পান কখন কখন এমন

১ 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম'-গীত, ৪।১১

একখানি মুখ আমরা দেখতে পাই, তা যেন জ্যোতি দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে আমরা চরিত্র পাঠ ক'রে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করতে পারি। ভাবচক্ষে হয়তো ইষ্টমূর্তি আমাদের সামনে আসতে পারেন, সহজেই তাঁকে প্রতীকরূপে গ্রহণ ক'রে আমরা মনকে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করতে পারি।

যদিও আমরা সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই কল্পনা করতে পারি, তথাপি চোখ দিয়েই বেশির ভাগ কল্পনা করি। এমন কি, কল্পনা পর্যন্ত অর্ধেক জড়। আর এক ভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, মানসিক চিত্র ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। পশুরা চিন্তা করে ব'লে বোধ হয়, কিন্তু তাদের যখন ভাষা নেই, তখন মনে হয়-ভাব ও প্রতীকের মধ্যে কোন বিশেষ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই।

যোগের সময় কল্পনাকে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করবে, কিন্তু সাবধান, তা যেন পবিত্র হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই কল্পনাশক্তির বৈশিষ্ট আছে; তোমার পক্ষে যে পথ খুব স্বাভাবিক, তাই অনুসরণ কর; সেটাই তোমার পক্ষে সব চেয়ে সোজা হবে।

পূর্ব পূর্ব সব জন্মের কর্মের শেষ ফল আমাদের এই বর্তমান জীবন। বৌদ্ধেরা বলেন, 'এক প্রদীপ থেকে আর এক প্রদীপ জ্বলে ওঠে।' প্রদীপ আলাদা, কিন্তু আলো সেই একই। সর্বদা প্রফুল্ল ও সাহসী থাকবে, রোজ স্নান করবে; ধৈর্য, পরিত্রতা, অধ্যবসায়-এই সব থাকলে তবে ঠিক ঠিক যোগী হ'তে পারবে। কখনও তাড়াতাড়ি ক'রো না। অলৌকিক শক্তি এলে মনে করবে ওগুলি বিপথ; তারা যেন তোমায় লুব্ধ ক'রে আসল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে না যায়। তাদের দূরে সরিয়ে দিয়ে তোমার যে একমাত্র লক্ষ্য -ভগবান্, তাঁকেই ধ'রে থাকবে। কেবল সেই চিরন্তনকে খোঁজ, যাঁর সন্ধান পেলে আমাদের চিরবিশ্রাম লাভ হয়। পূর্নত্ব লাভ করবার পর আর কিছুই কাম্য থাকে না, যার জন্য চেষ্টা করতে হবে; তখন আমরা চিরমুক্ত-সত্তাস্বরূপ।

সৎস্বরূপ,চিৎস্বরূপ,আনন্দস্বরূপ।

০৬. ষষ্ঠ পাঠ

সবিকল্প ও সুষুম্না। সুষুম্নার ধ্যান করা বিশেষ প্রয়োজন। ভাব-চক্ষে কখনও এর দর্শন পেয়ে যেতে পারো, এটিই সবচেয়ে ভাল উপায়। ঐভাবে দর্শন পেলে বহুক্ষণ তার ধ্যান করবে। সুষুম্না একটি অতি সূক্ষ্ম, জ্যোতির্ময়, সূত্রাকার, প্রাণময় পথ-মেরুদন্ডের মধ্য দিয়ে চলেছে, মুক্তির এই পথ দিয়েই কুন্ডলিনীকে ওপরে তুলতে হবে।

যোগীর ভাষায় সুষুম্নার দুটি প্রান্ত দুটি পদ্মে; নীচের পদ্মটি কুন্ডলিনীর ত্রিকোণকে ঘিরে আছে, আর উপরের পদ্মটি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারকে ঘিরে আছে। এ-দুটির মাঝখানে আরও পাঁচটি১ পদ্ম আছে।

উপরের দিক থেকে নিম্নের স্তর বা অবস্থাগুলি, চক্র বা পদ্মের নামঃ

সপ্তম-সহস্রার-মস্তকে।

ষষ্ঠ-আজ্ঞাচক্র-ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে।

পঞ্চম-বিশুদ্ধ-কন্ঠে।

চতুর্থ-অনাহত-বক্ষে বা হৃদয়ে।

তৃতীয়-মনিপুর-নাভিদেশে।

দ্বিতীয়-স্বাধিষ্ঠান-উদর-নিম্নে।২

প্রথম-মূলাধার-মেরুদন্ডের নিম্নে।

প্রথমে কুন্ডলিনীকে জাগাতে হবে, তারপর একটির পর একটি পদ্ম ভেদ ক'রে ওপরে তুলতে হবে, যে-পর্যন্ত না মস্তিষ্ক পৌঁছানো যায়। প্রত্যেক অবস্থা বা ভূমি হচ্ছে মনের নতুন নতুন স্তর।

১ ইংরেজী সংস্করণে আছেঃ **'four other lotuses'**।

২ ইংরেজীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় একত্র ধরা হইয়াছে।